ভূমিকা

১৯৯১ সালে মে মাসের গরমের ছুটিতে কোন একদিন গয়েশপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে বই খুঁজতে খুঁজতে হাতে পেয়ে যাই দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' বইখানি। রিডিং রুমে বসেই 'হাটের পথে' ও ন্যাওড়া নদীর খেয়া' অধ্যায় দুটি পড়ে ফেললাম। পড়ে মনে হল এ এক নতুন ধরনের বই। বইখানি বাড়ি নিয়ে এলাম। যত পড়ি ততই আগ্রহ বেড়ে যেতে থাকে। আগ্রহের কারণ বইখানি উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষিতে লেখা, আমি নিজে উত্তরবঙ্গের মানুষ। বইখানির ভাষা বাংলা ও রাজবংশী। বইখানিতে মূলত রাজবংশী জনগোষ্ঠীর নানা সমস্যার কথা লিখিত। আমি নিজেও রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই বইখানি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে ফেলতে লাগলাম। বইখানির নানা চরিত্র—বাঘারু, গয়ানাথ, আসিন্দির, মাদারি, মাদারির মা, রাধাবল্লভ, হৃষিকেশ তাদের কথা বার্তা চালচলন, হাবভাব আমার খুবই চেনা—একেবারে ছোট বেলা থেকে এদের যেন দেখে আসছি। বইখানিতে বিভিন্ন ঘটনা—যেমন জমি জরিপ, জরিপের কাজে নানা বাধা, তিস্তা ব্যারেজ নিয়ে বামফ্রন্ট-উত্তরখণ্ডের রাজনীতি, মিটিং-মিছিল, সম্মিলন, বন্যা এসব খুবই চেনা ও দেখা। এককথায় বইখানি একেবারে সমকালীন ইতিহাস। রাজবংশীদের নেতা পঞ্চানন মল্লিক ও সম্পৎ রায়কে তো সামনাসামনি দেখেছি। দেখা চরিত্র ও ঘটনা শিল্পরূপে পাঠ করার অনুভূতিই আলাদা।

তারপর সময় চলে গেছে তিস্তা প্রবাহের মতই। প্রায় বার বছর পর ২০০৩ সালে 'দে'জ পাবলিশিং'এর কলকাতাস্থ বইয়ের দোকানে বই কিনতে গিয়ে দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপুরাণ' বইখানি দেখতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কিনেই ফেললাম। টানা তিন মাস ধরে বইখানি আদ্যন্ত পড়ে তিস্তাপারের বৃত্তান্তের সঙ্গে এর মিল কোথায় খুঁজতে শুরু করলাম। কিন্তু মিলের চেয়ে অমিলই চোখে পড়ল বেশি। 'তিস্তাপুরাণ'ও বাংলা ও রাজবংশী ভাষার মিশ্রণে লেখা। এখানেও রাজবংশী জীবন, এখানেও তিস্তা, বন্যা, এখানেও ছোটদাদা, বিসারু, বাঙ্কুরাম। তৎসত্ত্বেও এর আবেদন ভিন্ন। এ এক নতুন ধরনের পুরাণ।

মনে মনে ভাবলাম এই বই দুখানিকে নিয়ে তো গবেষণার কাজ করা যায়। আমার এই মনোভাব জানিয়ে ফোন করলাম আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ প্রতীপ মজুমদারকে। তাঁকে এই বই দুইখানির বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলাম। তিনি আমাকে উৎসাহিত করলেন। তিনি নিজেও কোচবিহারের মানুষ। দেবেশ রায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় রয়েছে, তাঁর রচনা সম্পর্কেও ধারণা আছে। স্যারের উৎসাহ, আশীর্বাদ মনে করে গবেষণার ইচ্ছাটিকে সংকল্প হিসেবে গ্রহণ করলাম।

উত্তরবঙ্গ আমার জন্মভূমি। উত্তরবঙ্গের নদী, পাহাড়, জঙ্গল, মাটি ও মানুষের কাছে আমি চিরঋণী। ভাবলাম তাদের সম্পর্কে কিছু কথা বলে খানিকটা ঋণ স্বীকার করব। তাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে নাম নথিভুক্ত করে গবেষণার কাজে ব্রতী হলাম। আমার এই গবেষণা কাজে প্রথমেই স্মরণ করি নির্দেশক ডঃ সুবোধ কুমার যশের নাম। তাঁর সান্নিধ্য ও তত্ত্বাবধান আমার চিন্তাগুলিকে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত করতে সাহায্য করেছে। নিয়মিত যোগসূত্র রক্ষা করে তাঁরই নির্দেশ মত আমি আমার কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছি।

আর যাদের কাছে আলোচনা শুনে, বই নিয়ে পড়ে গবেষণার বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা সঞ্চয় করেছি তারা হলেন অধ্যাপক ডঃ রবিন পাল, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ মীর রেজাউল করিম। দেবেশ রায় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দিয়েছেন ডঃ রণজিৎ মিত্র ও আবছার আহমেদ আর সর্বক্ষণ উৎসাহ দিয়ে প্রেরণা জুগিয়ে ও নিয়মিত আলোচনা করে যাঁরা কাজটি সম্পন্ন করতে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন আমার দুই বাল্য বন্ধু ডঃ সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস ও ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ বর্মন।

আমার কর্মক্ষেত্র গয়েশপুর নেতাজী বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ বসু ও সহ প্রধান শিক্ষক সুবীর মুখার্জী মহাশয় আমাকে কাজের সময় ও সুযোগ করে দিয়েছেন। সেজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার পত্নী অতসী দাস প্রুফ সংশোধন, গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করে দেওয়া নানা কাজে সহযোগিতা করায় আমি সহজে কাজটি করতে পেরেছি। যেসব গ্রন্থাগার থেকে বই, পত্রপত্রিকা ও নানা তথ্য পেয়ে গবেষণাকর্ম সমাধা করেছি, সেগুলি হল— গয়েশপুর পাবলিক লাইব্রেরী, গয়েশপুর নেতাজী বিদ্যামন্দির লাইব্রেরী, লিটল ম্যাগাজিন সেন্টার ও গবেষণা কেন্দ্র (কলকাতা), বাংলা একাদেমি লাইব্রেরী (কলকাতা), কল্যাণী পাবলিক লাইব্রেরী (সেন্ট্রাল পার্ক), ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র টাউন লাইব্রেরী, বঙ্কিম ভবন, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া পৌর টাউন লাইব্রেরী, কাঁচরাপাড়া, স্টেট ইনস্টিটিউট অব পঞ্চায়েত এন্ড রুরাল ডেভলপমেন্ট লাইব্রেরী কল্যাণী, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নজরুল ইসলাম সরণী কলকাতা ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

সর্বোপরি লিপিকর সুরজিৎ ঘোষ, তিনি কঠোরশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে গবেষণা পত্রখানি মুদ্রিত করে দিয়েছেন। সে জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পঞ্চাশের দশক বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের উত্তেজনা, নতুন মূল্যবোধ ইত্যাদি হল পঞ্চাশের দশকের পটভূমি। এই যুগ পটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে যে ক'জন কথাসাহিত্যিক এই দশকে প্রাথমিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, পরবর্তী ষাট-সত্তর

দশকে, এমনকি এখনও অনেকে সার্থক ভাবে লিখে চলেছেন তাঁদের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবী, বরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মতি নন্দী, কবিতা সিংহ, আনন্দ বাগচি, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখ প্রতিনিধিস্থানীয়।

পঞ্চাশের দশকের এই প্রতিভাবান লেখকেরা তাঁদের নিজস্ব বিষয় ও শৈলীতে বাংলা কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে চলেছেন। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিজীবন ও রচনা সম্পর্কে গবেষণা খুবই কম হয়েছে। কাউকে কাউকে নিয়ে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ পেলেও অনেকে তার বাইরে রয়েছেন। দেবেশ রায় তার মধ্যে একজন। অথচ পঞ্চাশের দশকের কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে দেবেশ রায় একটি স্বতন্ত্র ধারা। তিনি একাধারে গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, সম্পাদক, সাংবাদিক, উপন্যাসতাত্ত্বিক। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গল্প উপন্যাস তাঁর কাহিনি বৃত্ত প্রধান না হয়ে হয়েছে মনন ঋদ্ধ। নির্মম জটিল বাস্তব অনুভবের গাঢ়তায় নির্মিত তাঁর কাহিনি, অ্যাখ্যান, বৃত্তান্ত। সময়ের পরিবর্তন মানুষকে নিয়ত বদলে দিচ্ছে, বিশ্বায়ন এসে ঢুকে পড়েছে মধ্যবিত্ত, গ্রাম্য জীবনের হেঁসেল ঘরে সেই বদলের চিত্র বর্ণিত হয়েছে তাঁর গল্প উপন্যাসের নতুন ফর্মে। তাঁর রচনার মূল বিষয় মানুষ, নাগরিক ও গ্রাম্য উভয় স্তরের মানুষ। এই মানুষের কথা তিনি যে ভাষায় লেখেন তারও একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের চেয়ে তিনি সর্বাধিক অনুপঙ্খ তথ্যসহ ঘটনা বা আখ্যানের বর্ণনা দিয়ে যান। সে জন্য তা হয়ে ওঠে চিত্রল ও সজীব।

উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষিতে রচনাগুলিতে রাজবংশী, মদেশিয়া, পূর্ববঙ্গীয় ভাটিয়া মানুষের ভাষা এসেছে বর্ণনায়, কথোপকথনে। সেজন্য তাঁর শিল্পবাচন হয়ে উঠেছে আরও বাস্তব ও সুস্পষ্ট। সেজন্য দেবেশ রায়কে নিয়ে গবেষণা করা একটি সাংস্কৃতিক দায় মনে করে আমি তাঁর সাহিত্য কর্মের বিশেষ একটি দিক তিস্তা কেন্দ্রিক উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'র ওপর একটি সমীক্ষার কাজে ব্রতী হয়েছি। বিষয়টিকে গবেষণাকর্মে আনার জন্য নিম্নরূপে অধ্যায় বিভাজন করেছি।

প্রথম অধ্যায় ঃ দেবেশ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন, রচনা। ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় ও তাঁর রচিত উপন্যাসের ধারায় 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'এর পর্ব-পরিচয়, কাহিনি-সংক্ষেপ। তিস্তাপুরাণ এর পর্ব-পরিচয়, কাহিনি-সংক্ষেপ।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত : রচনারীতি ও স্বরূপ বিচার

তিস্তাপুরাণ : রচনা রীতি ও স্বরূপ বিচার

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ভাষা : তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ-এর ভাষা, রাজবংশী ভাষা ব্যবহারে বিশেষত্ব।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ নদী তিস্তা : অন্যান্য বাংলা নদী-উপন্যাস : তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে নদী।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ উপসংহার : অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়সমূহের পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে গবেষণা কর্মের সিদ্ধান্ত রচনা।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথমেই আছে দেবেশ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন। তাতে তাঁর জন্ম, বাল্যকাল, শিক্ষা, রাজনৈতিক জীবন, সাংবাদিক জীবন, গল্পকার ও ঔপনাসিক দেবেশ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এরপর সময় অসময়ের বৃত্তান্ত, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ এর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত রচনার উদ্দেশ্য এবং প্রায় ২০ বছর পর ফের কেন তিস্তা-কেন্দ্রিক আরেকটি উপন্যাস 'তিস্তাপুরাণ' লিখলেন সে সম্পর্কে কিছু কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি গ্রন্থপরিচিতি। যে দুটি গ্রন্থ 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' গবেষণার মূল বিষয় সেই উপন্যাসদুটির কাহিনি সংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে মূল বইয়ের ক্রম অনুসরণ করে। বই দু'খানি পর্বভিত্তিক। তাই পর্বপরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে প্রতিটি পর্ব এবং পর্বের অন্তর্গত অধ্যায়ের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এবং কোন্ পর্বে পৃষ্ঠাসংখ্যা কত তাও দেখানো হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আছে উপন্যাস দু'খানির রচনারীতি ও স্বরূপ বিচার। উপন্যাসের বিষয়কে বলবার ধরনই হল রচনারীতি। প্রচলিত প্লট, কাহিনি, চরিত্র সৃষ্টির প্রাধান্য নয়। আদি, মধ্য অন্ত্য'র ধরন নয়। এপিসোডিক, কথান্তর, কথা বিস্তার, বৃত্তান্তর, অনুপুঙ্খ বর্ণনা, বিশেষ ধরনের ভাষা প্রয়োগ, দেশীয় গল্প কথকতার ভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন রচনা রীতির আলোচনা করা হয়েছে উভয় উপন্যাসে।

স্বরূপ বিচারের ক্ষেত্রে উপন্যাস দু'খানি কোন্ গোত্র বা শ্রেণিভুক্ত তা আলোচিত হয়েছে । সে জন্য উপন্যাসের মূল বিষয় বলতে গিয়ে আরও নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, যা মূল বিষয়েরই সহায়ক। বিভিন্ন গোত্রের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করে উপন্যাস দু'খানির নানা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোন জাতি বা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তা বলা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ভাষা নিয়ে। দেবেশ রায়ের এই দুই উপন্যাসের ভাষার বিশেষত্বে বাংলা ও রাজবংশী ভাষায়

লিখিত উপন্যাস দু'খানিতে বর্ণনার ভাষা, চরিত্রের সংলাপ, স্বগতোক্তি ইত্যাদি কীভাবে একটি নতুন ভাষার ছাঁদ তৈরি করেছে তা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে রাজবংশী ভাষাই বা কীভাবে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়ে কথায় নতুন নতুন অর্থের স্তর তৈরি করেছে, সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বহুস্বর সৃষ্টিতে সংলাপের ভাষা কতখানি সার্থক হয়েছে তাও দেখানো হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বাংলা কথা সাহিত্যের নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'গঙ্গা' উপন্যাসের সঙ্গে দেবেশ রায়ের নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ-এর তুলনা মূলক আলোচনা। এছাড়া উত্তরবঙ্গের নদী, তিস্তা নদীর আলোচনা, সবশেষে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে তিস্তা নদীর ভূমিকা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে অধ্যায়-ভিত্তিক বিষয় সমূহের পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা বিষয়ে সিদ্ধান্ত। অধ্যায়টি গবেষণা কর্মের উপসংহার।

দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' বাংলা কথা সাহিত্যের ধারায় অনন্য। আমি দেখাতে চেয়েছি দেবেশ রায়ের নিজের উপন্যাস ধারাতেও এ উপন্যাস দুটির স্থান সম্পূর্ণ আলাদা। 'যযাতি' থেকে তার উপন্যাস লেখার যে ধারাটি তিনি প্রবর্তন করেছেন তাতে দেখা গেছে যতগুলি উপন্যাস তিনি লিখেছেন তার প্রত্যেকটির বিষয় যেমন আলাদা, বিষয় উপস্থাপনের ভাষাও তেমনই আলাদা। তবে লেখার রীতি অনেকটাই প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। কিন্তু তিস্তাপারের বৃত্তান্তে এসে তিনি আবিষ্কার করলেন এক সম্পূর্ন আলাদা রীতি। ছোট ছোট এপিসোড, যা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, এমনকি যেগুলির কিছু কিছু অন্যান্য পত্র পত্রিকাতেও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিকে সাজিয়ে, আভ্যন্তরীন সম্পর্কযুক্ত করে গড়ে তুললেন মহাকাব্যেপম উপন্যাস যা গড়নে নবীন। ইতিপূর্বে এ ধরনের উপন্যাস বাংলা কথা সাহিত্যে আর আসেনি, তার নিজস্ব রচনা ধারাতেও আসেনি। তিস্তাপারে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হস্তক্ষেপে প্রাকৃতিক পরিবেশের বদল ঘটে যাওয়ায় তার প্রভাবে কীভাবে মানুষের প্রাকৃতিক জীবন বদলে যাচ্ছে সে কাহিনি বিবৃত হয়েছে। বন পাহাড় নদীর সাথে সহাবস্থানে প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির মতই যে রাজবংশী, মদেশীয়া, ভাটিয়া, প্রভৃতি মানুষ এতদিন তাদের জীবন জীবিকা, রীতি নীতি, উদ্‌যাপন করে জীবন অতিবাহিত করে চলেছে তিস্তার ওপর ব্যারেজ তৈরিতে সেই প্রাকৃতিক তিস্তার মৃত্যু ঘটে যাবে। ইতিহাস ও ভূগোল দুইয়েরই বদল হয়ে যাবে। ব্যারেজ তৈরিতে বন কাটা পড়বে, নগর নির্মাণ হবে, বনের পশুরা নতুন বনে চলে যাবে। প্রাকৃতিক বনের বদলে মানুষের হাতে

তৈরি হবে তাদের প্রয়োজনের বন, যা থেকে কল কারখানার কাঠ পাওয়া যাবে। ব্যারেজের জলে জমি উর্বরা হবে, নতুন ধরনের চাষে রাসায়ণিক সারের ব্যবহার,-হাইইল্ড ধানের চাষ হবে।

ফলে বিঘা প্রতি ১৫/২০ মন ধান হবে, মানুষ কম জমিতেই বেশি ফলন পাবে। ফলে গয়ানাথের মত জোতদারদের বেশি জমি রাখারই প্রয়োজন হবে না। কৃষক সমিতির রাধাবল্লভ, হৃষিকেশদের সঙ্গে আর গয়ানাথের সংঘর্ষ হবে না জমি নিয়ে। বরং এরা ধানের বেশি দাম আদায়ের জন্য একত্রে রাস্তা রোকো আন্দোলনেও সামিল হতে পারে। কিন্তু বাঘারু, মাদারি, মাদারির মা যারা একেবারেই প্রাকৃতিক জীবন কাটিয়েছে। কোন অর্থনীতি যাদের কোন দিন স্পর্শ করেনি। দারিদ্র্য সীমার নিচের নিচে যাদের অবস্থান, এই উন্নয়ন বা পরিবর্তন তাদের কোন কাজে লাগবে? ভারতের ১০০ কোটির দেশের ৬-৭ কোটি যারা বাঘারু, মাদারি, মাদারির মা'র মত তারা বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি নীতি, শিল্প নীতি, কোন কিছুর সুফলই পাবে না। মাদারির মা তার ওই শ্যাওড়াঝোরায় পাতার ঘরে ধীরে ধীরে মরে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। তার সামনের রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যে ভারতবর্ষ যাতায়াত করে তারই সামনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর বাঘারু-মাদারিরা মানুষের তৈরি নদী ও বন ছেড়ে নতুন নদী বনের খোঁজে হাঁটতেই থাকবে।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' লেখার পর তিনি আরও অনেক কিছু লিখেছেন কিন্তু সেগুলি এরকম ব্যাপক বিস্তৃত পটভূমি নিয়ে নয়। এমন মহাকাব্যিক বিস্তার সেগুলির মধ্যে নেই। প্রায় ২০ বছর পর তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মত আর একখানি মহাকাব্যিক উপন্যাস তার হাতে রচিত হল 'তিস্তাপুরাণ'। পুরাণে যেমন সৃষ্টি, প্রলয়ের পর নব সৃষ্টি, বংশ বর্ণন, মন্বন্তর, চৌদ্দ মনুর শাসন বিবরণ, পৌরাণিক রাজগণের আখ্যায়িকা — ঠিক তেমনি তিস্তাপারের তথা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের জন্ম-মৃত্যু-সংস্ক্রিয়া, বংশবর্ণন, দৈনন্দিন—আহার, শোওয়া-বসা, পার্বণ, রীতিনীতি, গান, ছড়া, ফাকালী, ছিলকা, প্রবাদ, রসরসিকতা, রাজনীতি, খরা-লেভি, জমি দখল, জমির পাট্টা ও বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

আলোচিত হয়েছে একই রীতিতে - এপিসোডিক, কথান্তর, বৃত্তান্তর, কথার বিস্তার, অনুপুঙ্খ বর্ণনা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে ভাষার ছাদ তিস্তাপারের বৃত্তান্তের চেয়েও ভিন্ন প্রকৃতির। সহজ বাক্য কিন্তু ব্যঞ্জনায় জটিল। তিস্তাপুরাণের মূল প্রতিপাদ্য পুরাণের মত জীবনের নানা যুদ্ধ জয় পরাজয়, শেষে শান্তির খোঁজে যাত্রা। এখানে ছোট দাদা যাচ্ছে সেই শান্তির খোঁজে 'খিদার পাকে'। এখানে একটা গোতের ক্রম পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় নতুন রাস্তা, নতুন গাড়ি, যানবাহন, নতুন চাষ, বিঘায় ১৫ বা ২০ মন ধান,

নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা, গ্রামে গ্রামে স্কুল, মেয়েদের পোশাক আশাকে পরিবর্তন, জীবনচর্চায় পরিবর্তন। কিন্তু তবু এ উন্নয়নে অর্থাগম হবে, দারিদ্র্য ঘুঁচবে না। প্রকৃত শান্তির জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে। হতে পারে সে অপেক্ষা কয়েক মানব জন্ম।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত-র মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বলার জন্য লেখককে এক বিশেষ ভাষারীতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। বাংলা ও রাজবংশী ভাষার যথোপযুক্ত ব্যবহারে উপন্যাসটির বিষয় সজীব ও গতিশীল হয়ে উঠেছে।

বর্ণনার ভাষা বাংলা। চলতে চলতে রাজবংশী বাচনের সহায়তায় এক নতুন রূপ ধারণ করেছে। কথোপথন বা সংলাপে রাজবংশী ভাষার ব্যবহার বক্তব্যকে বহুস্বরিক করেছে। অর্থকে দু'তিনটি স্তরে নিয়ে গেছে। রাজবংশী ভাষা ছাড়াও মদেশিয়া, ভাটিয়া, ভাষারীতি, সংলাপ, বক্তব্যকে অধিকতর বাস্তব করে তুলেছে।

তিস্তাপুরাণ-এর ভাষা আপাতসহজ হলেও ভাব অত্যন্ত জটিল। বিশেষ ভাবে পাহাড়ে বানা ঝুলে থাকা, জননী কাউঠানী প্রসঙ্গ, নদী খুঁজতে ঘাটোয়ালের গল্প, তিস্তার চরে হাতির ডুবে যাওয়া, বুড়িমার বিশাল গোত ইত্যাদি মিথযুক্ত কথা গুলি উপন্যাসখানিকে ভাবগত জটিলতার শীর্ষে নিয়ে গেছে। এই জটিলতার মধ্যেই ব্যক্ত হয়ে আছে রাজবংশী সমাজ। তাদের সহজ সরল জীবন পুরাণের মত জটিল ও পূর্বতন।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' দেবেশ রায়ের উপন্যাসের ধারায় দুটি ভিন্ন রীতির, ভিন্ন বিষয়ের উপন্যাস। সেইসঙ্গে বাংলা উপন্যাসের ধারায়, বিশেষত পঞ্চাশ দশকের কথা সাহিত্যের ধারায় দেবেশ রায় যে একটি স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা এবং এই উপন্যাস দু'খানি যে সেই স্বতন্ত্র ধারার নবতম ফসল, সে কথা গুলি সন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে কেন্দ্রস্থ করার চেষ্টা করেছি।